হেকেটির পদপাত

> এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাড়ির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।
>
> [*ছেলেবেলা* পৃ. ৫৩]

নিজেকে তুচ্ছ করে নতুন বউঠানকে বড়ো করে তোলা রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। সূচনা তার প্রথম আবির্ভাবের দৃশ্যেই। বালক রবির সামনে সেই খুলে গেল জাদুজগতের জানলা, কিটস্ যাকে বলবেন, ''Charmed magic casement''! এই আদরের আসন অবশ্য কাদম্বরীর সারাজীবন সয়নি, এক সময়ের বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্তার জীবন থেকে উত্তরকালে একটু একটু করে যেন হারিয়ে যায় গুণী স্বামীর গুরুত্ব। এই গুরুত্ব ও আদরের পরিবর্তন গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে, যার প্রতিফলন তাঁর রচনায় আসা খুবই স্বাভাবিক। *মালঞ্চ*-র নায়িকা নীরজা যে ভাবে সমাদরের তুঙ্গ থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যায় আদিত্যর জগত থেকে তাতে কাদম্বরীর ছায়াপাত যেন ধরাই পড়ে যায়।

বউঠানের সঙ্গে বাগানের যোগাযোগ কবিজীবনে একাধিক। সূচনা খোদ ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোতেই :

> ছাদটাকে বউঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলে ছিলেন। পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ; আশে পাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

এ হয়তো নীরজার দীক্ষিত বাগানচর্চা নয়, কিন্তু প্রভাব তো এমন খাপে-খাপে আসে না। জগদীশ ভট্টাচার্যর মতে রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে হ্লাদিনী শক্তির যে লীলায় তাঁর আত্মোন্মেষ ঘটেছিল সেই লীলাই অমলের কৈশোর কাহিনিতে শিল্পসত্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে (নেপথ্যবিধান, *কবিমানসী*, প্রথম খণ্ড) 'নষ্টনীড়' গল্পেও আশ্চর্যজনকভাবে এসে গেছে বাগান ও বাগানচর্চার অনুষঙ্গ:

> ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়।
>
> এই ভূখণ্ডের উন্নতি সাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

ছবি এঁকে, প্ল্যান করে বাগান সাজানোর আগ্রহ নীরজার রোগশয্যাতেও যায়নি। মৃত্যুর

পদশব্দ যখন বেশ প্রকট তখনও সে আদিত্যর কাছে চায় বাগানের ম্যাপ আর ডায়রি। হয়তো কিশোরবেলার কিছু মধুর স্মৃতিই এই নীরজার না থেকেও শেষ-সৃষ্টির মধ্যে সজীব থাকার স্পৃহায় ঠেলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

কাদম্বরীর মৃত্যুর পর দু-বছরের মধ্যে যে-কটি গদ্য রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ লক্ষণীয়ভাবে তার মধ্যে দুটির নাম 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'শিউলিফুলের গাছ'। কাদম্বরী-র স্মৃতিবাহী 'পুষ্পাঞ্জলি'-র একটি অনুচ্ছেদ এইরকম :

> তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহা কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ যে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাত তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে, বুঝি তাহারই পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে, তুমি এস, তোমাকে রোজ ফুল দিব।

দুটি বিষয়ের মিল এখানে প্রনিধানযোগ্য। প্রথমটি গাছের নিবিড় পরিচর্যাজনিত যা কাদম্বরী ও নীরজাকে মিলিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টি গাছের বার্তাপ্রদান যা রোগশয্যায় শায়িত নীরজার ক্ষেত্রে আমরা দেখি। মৃত্যুর পরের যে Communicaiton কবির সংবেদনে ধরা পড়ছে তারই প্রতিচ্ছবি সঞ্চারিত হয়েছে রোগশয্যায় অকর্মণ্য হয়ে শায়িত নীরজার ক্ষেত্রে :

> বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিঃশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কেমন আছ?"

আরেকটি বিষয় উল্লেখের তাৎপর্য রাখে। কাদম্বরীর মৃত্যুর পর রজনীগন্ধা গাছের সংযোগের কথা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের একদম শুরুতেই আমরা দেখি এক কোণে পিতলের কলসিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়। অর্থাৎ কাদম্বরীর মৃত্যুর পরের অনুষঙ্গ আবারও দেখা গেল নীরজার রোগশয্যার আবহে।

তপোব্রত ঘোষ তাঁর *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ* গ্রন্থে 'নিশীথে' গল্পের অনুষঙ্গে কাদম্বরী ও চন্দননগরের বাগান বাড়ির কথা এনেছেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ বর্তমানের সান্নিধ্যে নিবিড় সময় কাটিয়েছেন (সাধনা-ভারতী পর্ব পৃ. ১২৫) :

> ১৩০১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'নিশীথে' সাধনায় প্রকাশিত হয়। সাধনা-য় এর পরের মাসে প্রকাশিত গল্প 'আপদ'। আপদ গল্পের ঘটনাস্থল চন্দননগরের বাগানবাড়ি। বকুলবৃক্ষশোভিত গঙ্গাতীরস্থ চন্দননগরের বাগান বাড়ি 'নিশীথে' গল্পে 'বরানগরের বাড়ি'-র আড়ালে মুখ লুকিয়েছে।

সেখানে একথাও তিনি উল্লেখ করেন যে প্রায় চল্লিশ বছর আগেই রবীন্দ্রমানসে এসে গেছে *মালঞ্চ*-র রূপকল্প। কথাটি শুধু বাগানের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য কাদম্বরীর অনুষঙ্গেও। তফাৎ অবশ্য একটা আছেই। 'নিশীথে' সয়ে নিয়ে সরে যাবার গল্প। দক্ষিণাচরণের অপরাধী মনের যন্ত্রণার মাধ্যমে এসেছে লেখকের প্রতিবাদ। অন্যদিকে *মালঞ্চ*-য় প্রতিবাদে সামিল করেছেন স্বয়ং নীরজাকেই, যার মাধ্যমে 'মধ্যবর্তিনী' থেকে শুরু হওয়া দুই নারী, বাগান, প্রথম নারীর গুরুত্ব কমে যাওয়ার গল্পের সমাপ্তি ঘটালেন Not with a whimper but a bang।

দুই.

> দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে। পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাৎলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা। [*ছেলেবেলা* ৫৬-৫৭]

আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্ধ্য আসরের আয়োজনের একটি ছবি পেলাম। বলাই বাহুল্য, এই আসরের আয়োজনের কর্ত্রী ছিলেন কাদম্বরী দেবী যার ভূমিকার কথা আমরা পরে আবার উল্লেখে আনব। আপাতত আমরা আসব নীরজার সঙ্গে রমেনের আলপচারিতায় (ষষ্ঠ অধ্যায়) যেখানে আজকের মর্মযন্ত্রণায়, বিচ্ছিন্নতায় দগ্ধা নীরজা ফিরে তাকাচ্ছে তার ফেলে আসা সোনালী দিনগুলির দিকে যখন স্বামী-সোহাগে তার জীবন পরিপূর্ণ ছিল :

> কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'।

কিছু তফাৎ সত্ত্বেও পান, বেলফুল ও সান্ধ্য আসরের আশ্চর্য মিল পেলাম আমরা। কাদম্বরীর 'অন্নপূর্ণা'- মূর্তিরও কিন্তু পরিচয় আছে *ছেলেবেলা*-য :

> দুপুর বেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বউঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর বেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর-তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা।

আমরা আবার ফিরব নীরজার-আত্মবিলাপে। এবার সে কারুকে বলছে না তার বেদনার কথা, কিন্তু আপনমনে ভেবে চলেছে স্বামীর কাছ থেকে একসময় পাওয়া নিবিড় আদরের কথা :

> বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলছে, "আমার রঙমহলের সাকী।" দশ বছরে রঙ একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে-পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারই দু ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছে মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বলত, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।"

আমরা মনে করি 'নন্দনবনের ইন্দ্রাণী' বিশেষণটি নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে নীরজা চরিত্রটিকে বোঝার জন্য। ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সদস্য অজয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী তাঁর 'ভারতীর ভিটায়' লিখেছেন :

> প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানসকন্যা। প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাহাকে' লইয়া 'বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটিতে যাইতেন। কোন কোন দিন

> আমরা জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়িতে যাইতাম। সেখানে ন'বউঠাকুরাণী, নতুন বউ, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। 'ভারতী'-র জন্মস্থান ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ভবনটি তখন ভারতী উৎসবে নিত্য মুখরিত। জ্যোতিবাবুর তেতলার ছাদে টবের গাছ সাজাইয়া বাগান করা হইয়াছিল, 'তিনি' নাম দিয়াছিলেন 'নন্দনকানন'। সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ সকলেই সেখানে নিত্য নিয়মিত মিলিত হইতেন। [*কবি মানসী* ১ : আবির্ভাব]।

অর্থাৎ 'নন্দনবন' শব্দটি একটু ভিন্নভাবে ঠাকুববাড়ি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং কাদম্বরীর জীবনে একটা বিশেষ স্থান দখল করেছিল। আদিত্যর নন্দনবনে ইন্দ্রাণী ছিল নীরজা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (যাঁর নামে আবার 'ইন্দ্রত্ব' স্পষ্ট বিদ্যমান) নন্দনকাননে কাদম্বরীর ইন্দ্রাণীর মতো স্থানই যে ছিল তার একাধিক বর্ণনা আমরা পাই বিভিন্ন জনের রচনায়। প্রথম বর্ণনাটি শরৎকুমারীর রচনা থেকেই নেওয়া যাক :

> ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্ব কেহ মানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি আমরা নেব খোদ ঠাকুরবাড়ির মানুষের কাছ থেকেই, রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরম স্নেহাস্পদ অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> সন্ধ্যেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর এক রকম, সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোট অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোট হলেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকিমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী।

যে বিশেষ গুরুত্বের আসন একসময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে কাদম্বরীদেবী পেয়েছিলেন ক্রমে তাতে লেগেছিল ভাঁটার টান আর সেই স্রোত হতাশার এমন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল তাঁকে যার পরিণতি হয়েছিল আত্মঘাতে। নীরজা আত্মঘাতী হয়নি ঠিকই, কিন্তু রোগশয্যার শেষ দিনগুলিতে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল আদিত্যর পরিবর্তন, দায়িত্ব কর্তব্যের অন্তরালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া আবেগময় স্বামীসোহাগ। তার কণ্ঠে, ভাবনায় বার বার ফুটে উঠেছে তীব্র অভিমান। কখনো তা ব্যক্ত হয় আদিত্য, রমেন বা আয়ার কাছে, কখনো-বা তা ঘুরপাক খেতে থাকে নিজের মনের অন্ধগুহায়। গুমরে গুমরে ওঠে তার বুকফাটা কান্না।

এই অভিমানের অনুষঙ্গেই আসি একটু আগেই উল্লেখিত অক্ষয় চৌধুরীর প্রসঙ্গে যিনি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরীর জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত ছিলেন। তাঁর লেখা 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাটি বিস্ময়করভাবে রবীন্দ্রনাথ স্থান দেন তাঁর প্রথম সংস্করণের 'প্রভাত সংগীত' গ্রন্থে। নিজের রচনায় এই কবিতাটির স্থান দেওয়ার কারণ শুধু 'ভারতী'-তে এই কবিতাটির 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র সঙ্গে একত্র প্রকাশই সম্ভবত নয়। কবিতাটির বিষয় অবহেলিত নারীর মর্মবেদনা যার মধ্যে বউঠানের দুঃখকেই ফুটে উঠতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাকে নিজের করে নিয়েছেন। কবিতাটির কিছু অংশ:

> রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন,
> হাসে হাসি কাঁদে কাঁদি মন-রেখে যাই
> মরমে মরম ঢাকি, তাহারি সম্মান রাখি
> নিজের রাজত্ব ভুলে তারেই ধেয়াই
> কিন্তু সে তো আমা পানে ফিরেও না চায়।

জগদীশ ভট্টাচার্য *কবি মানসী* ১-এ 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতার অনুষঙ্গেই পৌঁছেছেন 'সারদামঙ্গল'-এ (অভিমানিনী পতিব্রতা) যেখানে বিহারীলাল অন্যগামী পুরুষকে ধিক্কার জানিয়ে সোহাগবঞ্চিতা নারীর প্রতি গভীর সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছেন:

এস না ধরায় আর, এস না ধরায়!
পুরুষ কিম্ভুতমতি চেনে না তোমায়
মন প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইরে মন!
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যাসক্তি কাদম্বরীকে চুরমার করেছিল। সরলার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে-পড়া আদিত্যও মন ভেঙে দেয় নীরজার। এখানে যেন তাদের দুজনের দুঃখ সমাপতিত। এ তো গেল বিহারালীলের প্রিয় পাঠিকার করুণ জীবনে ব্যথিত কবির শোক ও ক্রোধ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে ভাদ্রের 'ভারতী'-তে প্রকাশিত একটি গানে (আত্মবিসর্জন : *কবি মানসী* ১) যাতে কাদম্বরীর প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার সুস্পষ্ট :

তোরা বসে গাঁথিস মালা,
তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়
ফেলে দেয়রে অনাদরে!
তোরা সুধা করিস দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে
ফিরেও যে নাহি চায়;
হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙে দিয়ে চলে যায়।
তোরা শুধু হাসি দিবি,
তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা
আর ত রবে না কাছে।
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙে মধু দিবি,
অশ্রু ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না কয়ে
শুকায়ে পড়িবি শেষে।

গানটির কথা নীরজার জীবনের ক্ষেত্রেও ভয়ংকরভাবেই প্রাসঙ্গিক। সম্পর্কের তুমুল দিনগুলিতে আদিত্য নীরজাকে "রঙমহলের সাকী" বলে সোহাগ জানাত। "তোরা সুধা

করিস দান / তারা শুধু করে পান" এই অনুষঙ্গটিকেই মনে করায়। আবার রোগশয্যায় শায়িতা নীরজার দুঃখ, ব্যথা, ক্ষোভ আদিত্য সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চায় না। তার অসহিষ্ণুতা দেখে মনে হয় সে হয়তো চায় নীরজা "প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে / প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে" শুধু "অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে" যাক।

তিন.

কাদম্বরী দেবীকে অন্তরঙ্গজনেরা অনেকে হেকেটি বলে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন 'শ্রীমতী হে-কে'। এই 'শ্রীমতী হে'-র উৎসসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন— "আমরা শুনিয়াছি 'হে' কাদম্বরী দেবীর কোনও ছদ্মনামের আদ্যাক্ষর। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'-এক গ্রিকদেবী।" গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী 'moon-goddess', 'the goddess of enchantment and magic'। কবিতার মতো রহস্যময় আর জাদুকরী বিষয় আর কি আছে? যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কবির অন্তরের কবি হতে পারেন তাঁর অন্তহীন জাদু সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

চাঁদের সঙ্গে আরও একটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় তা হল প্রবল হৃদয়াবেগ— হৃদয়াবেগ যা যুক্তিতর্ক মানে না। চাঁদকে তাই বলা হয় 'Eros', 'Feminine Principle', কাদম্বরীর হৃদয়াবেগ প্রবল বলেই নিষ্ঠুর শূন্যতার সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে না চালাতে পেরে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এবং পরে আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের উপরে অকালে দাঁড়ি টানেন। নীরজার চরিত্রেও এই প্রবল হৃদয়াবেগ লক্ষ করি আমরা। সম্ভবত খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবেই লেখক তার স্বামীর নাম রাখেন আদিত্য (জ্যোতিরিন্দ্রকে মনে রেখে?) যাকে গ্রিক পুরাণে masculine principle বা Logos হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Logos যুক্তিতর্ক মানেন সংযম প্রদর্শনে সক্ষম। আদিত্যকেও আমরা দেখি সরলার জেল থেকে ফিরে আসার সংবাদে 'উল্লাস' চেপে বার্তাবাহী চিঠি নীরবে নীরজার হাতে ধরিয়ে দিতে।

নীরজার পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই সরলার আগমন-সংবাদে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হয় না তা রমেন তাকে যতই ত্যাগের জপমন্ত্র বোঝাক। নীরজার স্বভাবে আসন্ন মৃত্যু এবং তাকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রবাহ অটুট থাকাকে মেনে নিতে পারে না। সে আদিত্যকেও বলিয়ে নিতে চায় তার মৃত্যুপরবর্তী অস্তিত্বের কথা, Logos কিন্তু তর্কের সীমারেখায় আটকে যায়:

> নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?

আদিত্যকে বলতে হল,

> "হ্যাঁ, মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

Eros আর Logos-এর তফাৎ এখানে অত্যন্ত প্রকট। যাই হোক, নীরজা থামে না, বরং বেশি করে challenge করতে চায় পুঁথিগত জ্ঞানকে:

> নীরজা অস্থির হয়ে বলেছিল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এখানেই

থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

'নিশীথে' গল্পে দক্ষিণাচরণের অপরাধী মনে হানা দিত তার প্রথমা স্ত্রী-র উপস্থিতি। নীরজা এখানে মৃত্যুর আগেই যেন মালঞ্চে তার প্রেত অস্তিত্বের ছবি এঁকে দিচ্ছে আমাদের সামনে যা হেকেটিকেই মানায়।

হেকেটির সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের যোগাযোগ আছে— infernal dogs। আদিত্যর সংসারে বিয়ের আগে ডলি ছিল তারই সঙ্গিনী। বিয়ের পর কিন্তু নীরজার দিকেই ঘুরে গেল ডলির আকর্ষণ। তার রহস্যজনক মৃত্যু নীরজার কোলে মাথা রেখেই। ডলির মৃত্যুই ছিল নীরজার দুর্দিনের সূচক। তারপরই তার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু এবং নীরজার মারণব্যাধির শুরু।

রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিকভাবে একাধিকবার চাঁদকে এনে নীরজার সঙ্গে প্রায় অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন। প্রথমটি একদম শুরুতেই :

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়।

দ্বিতীয়বার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শুরুতে। রমেন ঢুকছে নীরজার ঘরে :

ঘরের সব আলো নেভানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়। পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর, বাকি সমস্ত অস্পষ্ট।

পাশাপাশি সরলা যখন দিঘির সিঁড়িতে বসে আছে তখন 'চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া।'

চাঁদের আরও একটি অসাধারণ ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ। আদিত্য এখন তার প্রেম নিবেদন করছে সরলার কাছে :

সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।

খানিকটা কৌতুকচ্ছলে হলেও রমেনের সামনে নীরজা সরলার সৌন্দর্যের এক নিবিড় বর্ণনা দেয়। গোটা উপন্যাসে সরলার রূপের এত বিমুগ্ধতাময় বর্ণনা আমরা আর দেখিনি। এমনটি বোধহয় চন্দ্রদেবীর পক্ষেই সম্ভব! আদিত্যর চূড়ান্ত আবেগময় দৃষ্টিও তাকে অতিক্রম করতে পারে না, বড়োজোর সমান থেকে যায়— যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ।

নীরজার মৃত্যুদৃশ্যে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা চাঁদকে আর দেখতে পাই না, খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশের কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণি। এখানে জ্যোৎস্নার কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু এই দৃশ্যেই আমরা যেন মূর্ত হতে দেখব হেকেটিকে। ইয়ুং-পন্থী এক ভাষ্যকারের মতে Eros হল 'the moon goddess, acts upon him directly from the unconscious, approaching him intimately, like a traitor from within.' [*রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*-তপোব্রত ঘোষ, নিশীথে ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত।] রমেন জপমন্ত্র

জুগিয়েছিল, আদিত্য আর সরলা ভেবেছিল শেষ লগ্নে স্বীকৃতি দিয়ে যাবে তাদের সম্পর্ককে। কিন্তু 'like a traitor from within' শেষ জাগরণে উঠে দাঁড়ায় নীরজা আর প্রায় অলৌকিক ভঙ্গিমায় অভিশাপ দেয় সরলাকে :

> হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

Traitor-সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিশ্বাসঘাত কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গেই। আদিত্য ও সরলার বিশ্বাসভঙ্গকেই যেন শাস্তি দিয়ে গেল নীরজা।

এই প্রসঙ্গে পত্রপুট-এর 'ওরা ব্রাত্য, ওরা মন্ত্রবর্জিত' কবিতাটির উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। কবিতাটি আত্মজৈবনিক, কবির সৃষ্টিশীল জীবনের অন্তরালের অনেক পথই ধরা পড়েছে এখানে। কবিতার শেষ অংশে স্পষ্ট হয় কবির ভাণ্ডার :

> আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
> সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ
> আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।

কবিতায় কাদম্বরীর অলোকসামান্য ভূমিকার কথা এসেছে :

> মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
> তারই অতল থেকে।
> সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
> আমার সর্ব দেহে মনে,
> পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।

কিন্তু শুধু কাব্যে অনুপ্রেরণা নয়, কাব্যকে ও কবিকে পূর্ণতর করায় নয়, তাঁর প্রখর প্রতিবাদও উদ্দীপ্ত করেছে কবিকে :

> ইতিহাসের সৃষ্টি আসনে
> ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে :
> দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
> কদর্য কঠোরের অশুচি স্পর্শে
> তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
> বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি।

কাদম্বরীর স্বেচ্ছামৃত্যুতে হয়তো সেই প্রতিবাদের জ্বলে ওঠা। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নীরজার প্রতিবাদও বাঁধা রইল সেই একই তারে :

> বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে— চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল।

এই প্রসারিত হয়ে জ্বলে ওঠা চোখের তারায় আমরা 'রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র'-কেই দেখতে পেয়ে যাই।

নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে— লিখছেন হেমলতা দেবী (রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর: মৃণালিনীদেবী, পৃ ৩২, বিশ্বভারতী, ২২ শে শ্রাবণ ১৩৮১)। কাদম্বরীর এক বোনঝির নাম নীরজা! মাসীর ছায়ায় সৃষ্ট চরিত্রে বোধহয় বোনঝির নাম তাৎপর্যপূর্ণভাবেই রাখলেন রবীন্দ্রনাথ *মালঞ্চ* উপন্যাসে।